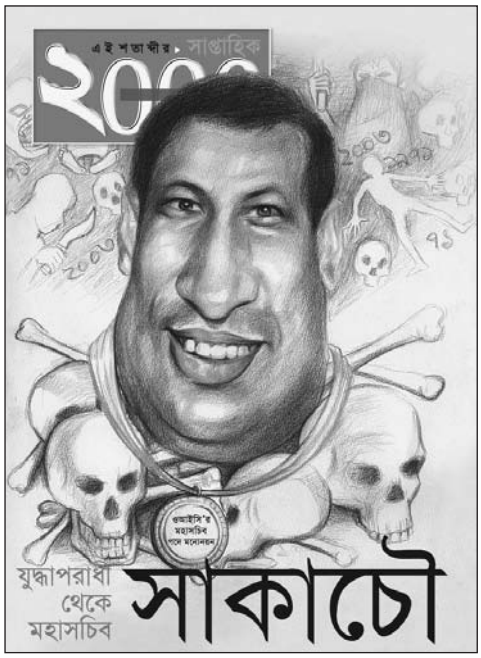

হযবরল সরকার

জাতির চেয়ে সাকাচৌ বড়!

গোলাম মোর্তোজা

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কিছু নেই। তিনি ও তার বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরী স্বনামেই আলোচিত। তাদের অতীতের কর্মকান্ড কারো অজানা নয়। '৭১-এ তারা চাননি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। শুধু তাই নয়, তাদের বাড়িতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের নির্যাতন সেল। অসংখ্য মুক্তিকামী বাঙালিকে ধরে এনে হত্যা করেছে সাকাচৌরা। এ কারণে তার নামের সঙ্গে যোগ হয়েছে 'যুদ্ধাপরাধী' শব্দ। 'গডফাদার', মাফিয়া'... আরো এমন অনেক পরিচিতি রয়েছে তার।

এরকম নানাবিধ উপাধি পাওয়া সাকাচৌ সব সময়ই বাংলাদেশের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব থেকে শুরু করে যখন যে সরকার ক্ষমতায় থেকেছে, সবার কাছেই তিনি গুরুত্ব পেয়ে এসেছেন। কারণ রীতিমতো রহস্যজনক। বিস্ময়কর রকমের ক্ষমতার মালিক তিনি!

ক্ষমতাবান সাকাচৌ তার ক্ষমতা আরো বাড়াতে চেয়েছিলেন। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার ইচ্ছা ছিল তার। হতে চেয়েছিলেন ওআইসির মহাসচিব। জোট সরকার তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু জিতিয়ে আনতে পারেনি। অসীম ক্ষমতাবান সাকাচৌ পরাজিত হয়েছেন শোচনীয়ভাবে। এই পরাজয়ে সাকাচৌ সম্ভবত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। মানসিকভাবে হয়ে পড়েছেন অসুস্থ। মুখে যা আসছে তাই বলছেন। শেখ হাসিনা সম্পর্কে 'সোনা' এবং 'স্বর্ণ' সুরঞ্জিত সেন সম্পর্কে 'অঙ্গ' কেটে ফেলা বিষয়ে যে কথা বলেছেন, তা কোনো পাগলের মুখ দিয়েও বের হওয়া কঠিন। একমাত্র বিকারগ্রস্ত মানুষের পক্ষেই এমন অরুচিকর, অশ্লীল কথা বলা সম্ভব।

সাকাচৌর নিজের নেত্রী খালেদা জিয়া সম্পর্কে তার কতটা শ্রদ্ধাবোধ তার প্রমাণও তিনি দিয়ে রেখেছেন।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে সাকাচৌ বিএনপিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েন। দলীয়ভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। এই সময়টাতে তারেক রহমান ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছিলেন বিএনপি'র রাজনীতিতে। বিএনপির নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তারেক রহমান। তখন সাকাচৌ মন্তব্য করেছিলেন, 'আগে জানতাম কুকুর লেজ নাড়ায়, এখন দেখছি লেজ কুকুরকে নাড়ায়'। তিনি এই বক্তব্যে কি বোঝাতে চেয়েছেন, কাদের ইঙ্গিত করেছেন বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তারপরও হাওয়া ভবনে ডেকে নিয়ে নমিনেশন দেয়া হয়েছে সাকাচৌকে। বিএনপি'র প্রার্থী হয়ে তিনি এখন জাতীয় সংসদ সদস্য। ওআইসির মহাসচিব পদে পরাজিত হয়ে সাকাচৌ শুধু ব্যক্তি বিশেষকেই আক্রমণ করছেন না, দেশের ইমেজেও ধস নামানোর পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছেন। তুরস্কে থাকা অবস্থায় তিনি ইউএনবিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নির্বাচনে ইসরায়েলি লবি বিজয়ী হয়েছে। ওআইসিতে এখন তুরস্কের পাশাপাশি ইসরায়েলের পতাকাও উড়বে। ঢাকায় ফিরেও তিনি একই কথা বলেছেন। বলছেন, ইরাকে সৈন্য না পাঠানোতেও নির্বাচনের ওপর প্রভাব পড়েছে ইত্যাদি।

বাংলাদেশের অনেকগুলো জায়গা সব সময় অযোগ্য লোকদের হাতে থাকে। এর মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অন্যতম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান সাকাচৌর বক্তব্য সম্পর্কে বলেছেন, এটা তার ব্যক্তিগত বক্তব্য। এর সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। যেদিন নির্বাচন হয়েছে সেদিন পর্যন্ত তিনি সরকারের প্রার্থী ছিলেন, এখন নেই।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খানের এ কথার অর্থ কী? সাকাচৌ কী এখন আর সরকারের অংশ নয়? সাকাচৌ প্রধানমন্ত্রীর সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা। সরকারপ্রধানের উপদেষ্টা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ পদ। এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে কেউ কী ব্যক্তিগতভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন, না পারা উচিত? সাকাচৌর 'ব্যক্তিগত মতামত' এটা বললেই কী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়?

সাকাচৌ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা যে স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ, সেটা কী মোর্শেদ খান হিসাব করেছেন?

মোর্শেদ খান সাকাচৌর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, ওআইসিতে সাকাচৌর বক্তব্যের পর যারা আমাদের ভোট দেয়নি তারাও বলেছে বাংলাদেশের প্রার্থী সবচেয়ে যোগ্য। মোর্শেদ খানের কথাটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। সাকাচৌর বক্তব্য সম্পর্কে দেশের মানুষের পরিষ্কার ধারণা আছে। শেখ হাসিনা, সুরঞ্জিত সেন বা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে

তিনি যা বলেছেন, সেটাই তার বক্তব্য। তিনি সব সময় এরকম বক্তব্যই দিয়ে থাকেন। অন্য ধর্মের মানুষ সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং মানবতাবিরোধী কথা বলাই তার বক্তব্য। সেই সাকাচৌর বক্তব্য শুনে মানুষ খুশি হয়েছে, এটা সত্যি কথা হতে পারে না। অবশ্য সাকাচৌর বক্তব্য সম্পর্কে মোর্শেদ খানের ধারণা না থাকার কথা নয়। এই সাকাচৌ মোর্শেদ খান সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি যখন থেকে রাজনীতি করি তখন মোর্শেদ খান লুঙ্গি পরে কৈ মাছ ধরতো।' সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, দেশের ভিত্তিতে না হয়ে ব্যক্তি হিসেবে ভোট হলে আমাদের প্রার্থী ৯৮% ভোট পেত।

কী চমৎকার বক্তব্য! এই বক্তব্যের অর্থ কী বোঝেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী? দেশ এবং জাতির চেয়ে বড় সাকাচৌ! যেসব দেশ বাংলাদেশকে ভোট দেয়নি তারা সাকাচৌকে ভোট দিত! মোর্শেদ খানের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাকাচৌর কোনো পরিচিতি ছিল না, এখনো নেই। তার সম্পর্কে অন্যরা কিছুটা জেনেছিল যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। একজন যুদ্ধাপরাধীকে কেন মানুষ ভোট দেবে, এ প্রশ্ন কি মোর্শেদ খান নিজেকে করেছেন? করে থাকলে নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার উত্তর তার পেয়ে যাওয়ার কথা। সাকাচৌ ভোট পেয়েছেন ১২টি। এর জন্য বাংলাদেশ সরকারের খরচ হয়েছে কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা। একটি ভোটের দাম পড়েছে প্রায় দেড় কোটি টাকা। ২০ কোটি টাকা খরচ করে দেশ কী পেল?

মোর্শেদ খান বলেছেন, দেশ পেয়েছে অনেক কিছু। বাংলাদেশ নাকি ওআইসিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বাকোয়াজ কথা বলার একটা সীমা থাকা উচিত।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবের পাশে বসে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করলো সুরঞ্জিতের অঙ্গ কর্তন করে, এ লঙ্ঘন কি ব্যক্তিগত মত? সরকারের লোক কি করে বলেন, ভিন্নধর্মীরা সরকার সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারবে না! সাকাচৌরাই কি বিএনপিকে অন্ধগলিতে নিয়ে যাচ্ছে? সেই সঙ্গে জাতিকে?

ইসলাম ধর্মের কোথাও বলা নেই, ভিন্ন ধর্মের মানুষ কথা বলতে পারবেন না। তারা অধিকার নিয়ে জীবনযাপন করতে পারবেন না এমন কথাও বলা নেই। অন্যের ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে, সর্বোপরি মানুষকে অসম্মান করা যাবে না। ইসলাম এটাকে একেবারেই সমর্থন করে না। অথচ সাকাচৌরা ইসলামের কথা বলে মানুষকে অসম্মান করছেন। এটা করতে পারছেন কারণ, সাকার জীবনে ধর্মের কোনো ব্যবহার নেই। মুখে ধর্মের কথা বললেও অন্তরে বিশ্বাস করেন না।

বাংলাদেশের পর-রাষ্ট্রনীতি যে কতোটা দুর্বল সেটা এবার খুব ভালোমতো প্রমাণ হলো। ওআইসির নির্বাচন নিয়ে যে কূটনৈতিক খেলা হয়েছে বাংলাদেশ তার কিছুই বুঝতে পারেনি। পুতুলের মতো প্রার্থী হয়েছে শুধু। আমেরিকা যেভাবে নাচিয়েছে, সেভাবেই নেচেছে। বিশ্বাস করেছে আমেরিকা সাকাচৌকে মহাসচিব বানিয়ে দেবে। আসলে এবার আমেরিকা কৌশলগত কারণে বাংলাদেশকে প্রার্থী করেছিল। কারণ আমেরিকা কোনোভাবেই চায়নি মালয়েশিয়া ওআইসির মহাসচিব পদে নির্বাচিত হোক। মাহাথির মোহাম্মদ আমেরিকা এবং ইসরায়েলবিরোধী কথা বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রেখেছিলেন। মাহাথির মোহাম্মদ আতঙ্ক ছিল আমেরিকার। ওআইসিতে মালয়েশিয়ার প্রার্থী মহাসচিব নির্বাচিত হলে মুসলিম বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আমেরিকার জন্যে কঠিন হতো। ওআইসি বের হয়ে আসতো রাজা-বাদশাদের হাত থেকে। মাহাথির বা মাহাথিরের মালয়েশিয়া দৃশ্য পাল্টে দিতো। এটা আমেরিকা ভালো করেই জানতো। সে কারণে বাংলাদেশ থেকে এই ভাঁড়টি দাঁড় করিয়ে ভোট ভাগ করা হয়েছে। আমেরিকা নিজে এবং সৌদি আরবকে দিয়ে বলিয়েছে, বাংলাদেশের প্রার্থীই ওআইসির মহাসচিব নির্বাচিত হবে। আর আমাদের অযোগ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটাই বিশ্বাস করেছে। '৭১-এ সাকাচৌ এবং আমেরিকার ভূমিকা ছিল অভিন্ন। এ কারণেই হয়ত সাকাচৌ আমেরিকাকে বিশ্বাস করেছিল।

এতো দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করতাম যেকোনো পরাজয়ই বেদনার, কষ্টের। এখন বিশ্বাস করছি কোনো কোনো পরাজয় বেদনার নয় বরং আনন্দের। সাকোচৌর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের পরাজয় হয়েছে। আসলে পরাজয় বাংলাদেশের হয়নি। পরাজয় হয়েছে জোট সরকার বিএনপি এবং সাকাচৌর। বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাকাচৌ পরাজিত হওয়ায় বাংলাদেশ যতোটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, নির্বাচিত হলে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো।

বাংলাদেশের রাজনীতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দুষ্টক্ষত সাকাচৌ। বিএনপির নেতা, মন্ত্রী অনেকেই চেয়েছিলেন এই দুষ্টক্ষত ওআইসির মহাসচিব নির্বাচিত হয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাক। কিছুদিন দূরে সরে ছিলেনও। কিন্তু পরাজিত হয়েই স্বমহিমায় আবির্ভূত হয়েছেন। এখন সাকাচৌর প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট আওয়ামী লীগকে সংসদ থেকে বের করে আনা। শেখ হাসিনা বা সুরঞ্জিত সম্পর্কে বক্তব্য সেই অ্যাসাইনমেন্টেরই অংশ। সুস্থ, স্বাভাবিক এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাকাচৌদের পছন্দ নয়। এতে তাদের গুরুত্ব কমে যায়। দেশে অস্বাভাবিক অবস্থা থাকলে সাকাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে সাকাদের জুড়ি নেই।

এটা বুঝতে পারছে না বিএনপি, খালেদা জিয়া। আওয়ামী লীগকে সংসদ থেকে বের করে রাজপথে নিয়ে এলে বিএনপির কোনো লাভ হবে না। দেশের তো নয়ই। লাভ হবে ষড়যন্ত্রকারীদের। সাকাচৌ যাদের অন্যতম।

দেশকে নিয়ে এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কিছুই কী করার নেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার? কোনো ভূমিকাই কী রাখতে পারেন না প্রেসিডেন্ট? সাকাচৌ কী দলে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ? দেশের চেয়েও সাকাচৌ বড়! সাকাচৌর দাবি, ওআইসি একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন। এই সংগঠন নিয়ে অন্য ধর্মের মানুষের কথা বলার অধিকার নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কোথাও বলা নেই কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারবেন না। সাকার এই বক্তব্য সংবিধান পরিপন্থি। দেশের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, জাতির সম্মান, শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন ঠেকানোর দায়িত্ব জনগণ যাদের দিয়েছে তাদের কী কিছুই করার নেই?

অভিনন্দন ড. একেমেলেদ্দিন

১৯৪৩ সালে জন্মগ্রহণকারী ইতিহাসের অধ্যাপক ড. একেমেলেদ্দিন ইনসানুগলু অনেক-গুলো আন্তর্জাতিক সংস্থার উঁচু পদে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সাল থেকে তিনি ওআইসির কাজের সঙ্গে যুক্ত। মহাসচিব নির্বাচিত হবার আগে ড. একেমেলেদ্দিন সংস্থাটির রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট অ্যান্ড কালচারের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মিসর, জর্ডান, সেনেগালসহ বিভিন্ন দেশের অনেকগুলো মর্যাদাকর পুরস্কার লাভ করেছেন।

তুরস্কের প্রার্থী ড. একেমেলেদ্দিন একজন দক্ষ কূটনীতিক। মুসলিম বিশ্বসহ সব অঙ্গনেরই পরিচিত মুখ। মুসলিম ইন্টেলেকচুয়াল হিসেবেও তার পরিচিতি রয়েছে। এমন একজন ব্যক্তিত্বের কাছে সাকাচৌ ছিলেন হাস্যকর প্রার্থী। উপরন্তু সাকার বিরুদ্ধে রয়েছে যুদ্ধাপরাধের মতো জঘন্য অভিযোগ।

ওআইসির মহাসচিব পদে বাংলাদেশ নির্বাচিত হলে সেটা খুশির খবর হতো, যদি প্রার্থী উপযুক্ত থাকতো। বাংলাদেশের মানুষ চায়নি সাকাচৌর মতো বিতর্কিত অশ্লীল কোনো ব্যক্তি দেশের প্রতিনিধিত্ব করুক। খালেদা জিয়া সরকার সেটা বুঝতে না পারলেও, ওআইসির সদস্য দেশগুলোর ভোটে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এ কারণে সাকাচৌর পরাজয়কে দেশের মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। অভিনন্দন ওআইসির সদস্য দেশগুলোকে যারা ভোট না দিয়ে পরাজিত করেছেন সাকাচৌকে। অভিনন্দন ড. একেমেলেদ্দিনকেও, তিনি পরাজিত করেছেন একজন রাজাকারকে।